শেষ ভালোর প্রতীক্ষায়

জয়নাল আবেদীন

অশ্বের বেগ আর নারীর চরিত্র, শুধু মানুষ কেন স্বয়ং ভগবানের জন্যেও নাকি অনুমান করা কঠিন। উদ্ধৃতিটা কার জান নেই, তবে এটা যে কোন লেখিকার নয় সেইটুকু নিশ্চয়তা হয়তো দেয়া যায়। এই উক্তির যথার্থতা বিচারের দায় এবং দায়িত্ব নেয়া আমার কম্ম নয়, কাম্যও নয় সেটা একেবারেই। অশ্বের গতিবেগ অনুমান করা কঠিন হলেও মনেতো হয় না একেবারেই অসাধ্য। কত লোকই তো অশ্বের উপর বাজি ধরছে, কেউ কেউ আবার বাজিমাত ও করছে। আর নারী চরিত্রের অনুমান পুরুষের চরিত্র অনুমানের চেয়ে গাণিতিক হিসেবে ঠিক কত শতাংশ কঠিন সেই তথ্য আমার জানা নেই। কারও যে জানা আছে এমন কথাও আজ পর্যন্ত শুনিনি। যেহেতু লেখালেখির জগতে এযাবৎ পুরুষেরই ছিল আধিপত্য,তাই নারী চরিত্রের চিত্রায়ণ মূলতঃ পুরুষের মেজাজ মর্জির উপরই মনে হয় নির্ভরশীল ছিল বেশী। তাইতো দেখি, যেই কবি এক সময় লেখেন, "এ বিশ্বের যতকিছু তার চির কল্যাণকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী/অর্ধেক তার নর/"। সেই একই কবি যখন ক্ষিপ্ত, তখন পূজারিনী কবিতায় তিনিই লেখেন, "নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো/ এরা দেবী, এরা লোভী/ যত পূজা পায় এরা/ চায় তত আরো/ ইহাদের অতি লোভী মন/এক জনে তৃপ্ত নহে/এক পেয়ে সুখী নহে/যাজে বহু জন"।

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থানের উপর ভবিষ্যৎ বাণী করা অশ্বের বেগ আর নারীর চরিত্র অনুমানের চেয়েও নাকি কঠিন। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটের উপর আমার অনুভূতি নিয়ে একটা লেখার কথা ভাবছি, এমন কথা শুনে জনৈক বন্ধু সেদিন এমনি একটা সতর্কবানী উচ্চারণ করেছিল। সেই প্রেক্ষিতেই উপরের অংশে ঐ ধান ভাণতে শিবের ঘি অবস্থা। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভবিষ্যৎবানী করার মতো সাধ এবং সাধ্য কোনটাই আমার নেই। বিজ্ঞ সুধী এবং সুশীল সমাজের জন্য সেটা তোলা থাক। তবে তত্বাধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা-লেখালেখি-অনুমান-আলোচনা-সমালোচনার যে বন্যা বয়ে গেছে এই কতদিনে, তার সাথে একাত্ব হওয়ার লোভটা শেষ পর্যন্ত কোন মতেই সম্বরণ করা গেল না।

তত্বাবধায়ক সরকারের সর্বাধিক আলোচনা ও সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু এখন দুদক। একে নিয়ে সাধারণ জনগণের আশা ও প্রত্যাশা অনেক। অবিশ্বাস্য সব ঘটনার জন্ম দিয়েছে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত পুরোনো এই প্রতিষ্ঠান। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বলে কথিত গড-ফাদার, রাজনৈতিক নেত্রীত্ব, মন্ত্রী-উপমন্ত্রী সহ বিগত দিনের দুই প্রধানমন্ত্রী আজ দূর্নীতির দায়ে বন্দী। স্বপ্ন নয়, ঘটনা দিনের আলোর মতো সত্য। দূর্নীতির দায় কারও কারও ক্ষেত্রে এখনো প্রমাণ সাপেক্ষ হলেও তাঁরা বিচারের দোরগোড়ায় অপেক্ষমান। এ সব কিছুই বাংলাদেশে ঘটেছে, ঘটছে। অবিশ্বাস্য, তবে সত্য। সার্বিক পরিসমাপ্তি নিয়ে এখনো সন্দেহের অবকাশ থাকলেও কর্ম পদ্ধতিতে তত্বাবধায়ক সরকারের যে অবস্থান, তা এখনো আস্থা রাখার প্রেরণা যোগায়।

তত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসে আওয়ামীলীগের গায়ে একটাও আঁচড় না দিয়ে বিগত সরকারের বেশ কিছু মন্ত্রী-উপমন্ত্রীকে দূর্নীতির দায়ে বন্দী করলে, সেদিন আওয়ামী শিবিরের আনন্দ দেখে কে? শেখ হাসিনাতো আনন্দের আতিশয্যে আমেরিকা যাওয়ার প্রাক্কালে বলেই

ফেলেন, তিনি ক্ষমতায় গেলে তত্বাবধায়ক সরকারের সমস্ত কর্মকান্ডকে বৈধতা দেবেন। আওয়ামী সমর্থকদেরও ঐ মুহুর্তের উল্লাস দেখার মতো। দেখেশুনে মনে হচ্ছিল মোটামুটি ভাবে সিংহাসনের পদতলে পৌঁছেই গেছে তারা। এখন সিংহাসনে আরোহণ করতে যতটুকু কষ্ট, সেইটুকু স্বিকার করা মাত্র। সংসদ ভবনের সাবজেলে এই মুহুর্তে বসবাসরত শেখ হাসিনাকে যদি তার পূর্ব উক্তি স্বরণ করিয়ে তত্ববধায়ক সরকারের বৈধতার ব্যাপারে আজ প্রশ্ন রাখা হয়, তবে তাঁর উত্তরটা কেমন হবে ভাবতে পারলে ভাল হতো। সেই সময় আওয়ামী সমর্থিত জনৈক কলামিষ্টতো ঐ মুহুর্তে জল্পনা-কল্পনায় একটা জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরাকারী অবকাঠামোর গুঞ্জণের সাথে বাকশালের কাঠামোগত আশ্চার্য্য মিল লক্ষ্য করে তত্বাবধায়ব সরকারের প্রশংসায় গদগদ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যেটা ১৯৭৫-এ চিন্তা করতে পেরেছিলেন বাংলাদেশের সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে ৩২ বছর পাড়ি দিতে হলো, এই বেদনা এবং আনন্দে তিনি কাতর।

১৯৭৫ এর সেই বাকশাল প্রেম ২০০৭ এর এই ক্রান্তিলগ্নে এসে নতুন করে উজ্জীবিত হতে দেখে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। প্রেমের চোখ মনে হয় সব সময়ই অন্ধ। বিদ্যান, বোকা, সাধারণ, সবার জন্যই মনে হয় এটা স্বাশত সত্য। সেই প্রথম দিন থেকেই যারা বাকশালকে প্রেমের চোখ দিয়ে দেখতে পারেনি, তাদের কাছে বাকশাল সমস্যা ছিল বহুমুখী। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নির্বাচিত একটা সরকার নিজের হাতে গণতন্ত্রের গলা টিপে হত্যা করে দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করছে আর তাই দেখে তাকে স্বাগত জানাতে আমাদের বুদ্ধিজীবি সমাজের একটা বিরাট অংশ পেখম মেলে ময়ূর নৃত্য করতে করতে বঙ্গভবনের সামনে দুই মাইল লম্বা লাইন তৈরী করছে, এমন দৃশ্য দেখে সাধারণ জনতার অনেকেই সেদিন ভিরমি খেয়েছিল। আমারতো বিশ্বাস সময়টা কোন ক্রমেই এমন একটা পরিস্থিতির অনুকুল ছিল না। ঘটনাটা যদি ১৯৭১-এ ঘটতো এবং শেখ মুজিব যদি অমন ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নয় সরাসরিই বলে দিতেন, এখন থেকে আওয়ামীলীগই হবে বাংলাদেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল, দেশের উন্নতির জন্য এর প্রয়োজন আছে, আমারতো মনে হয়না, অন্ততঃ সেই মূহুর্তে এর বিরুদ্ধে খুব বড় একটা প্রতিবাদ উঠার কোন সম্ভাবনা ছিল। তারপর ১৯৭৩ এর মার্চের নির্বাচনেও যদি আওয়ামীলীগ ঘোষনা দিত যে তারা বিজয়ী হলে দেশে বাকশাল কায়েম করবে, এবং মেন্ডেডসহ বিজয়ী হয়ে দেশে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করতো, তাহলে কি জনগনের এর বিরুদ্ধে সত্যিকারভাবে প্রতিবাদ করার কিছু ছিল? আমারতো মনে হয় না। বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি আজ কোন দল ঘোষনা দেয় যে তারা নির্বাচনে বিজয়ী হলে দেশে প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থা করবে, যেমন অতি সম্প্রতি ডঃ বদরুদ্দোজা ও কিছু রাজনৈতিক নেতৃত্বের আলোচনায় উঠে এসেছে এবং বিজয়ী হলে তারা সেটা করেও, তার সাথে ৭৫ এর বাকশাল ঘোষনার যে মৌলিক পার্থক্য আছে সেটুকু বোঝার ক্ষমতা একজন কলামিষ্টের অন্ততঃ থাকবে এমনটা আশা করা কি খুবই অনুচিৎ হবে?

১৯৬৯-৭১ এর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আর ১৯৭৫ এর শেখ মুজিব যে এক ছিলেন না, সেটা যেমন বঙ্গবন্ধু বোঝেনি তেমনি বোঝেনি আমাদের এই আজকের এই বন্ধুরা। সেদিন তাঁর পাশ থেকে তাঁর প্রশাসনিক শক্তি মুক্তিযুদ্ধের প্রমাদ পুরুষ তাজউদ্দিন আহমেদ বিতাড়িত, তাঁর আশে-পাশে ঘুরছে বন্ধু খন্দকার মোশতাক, আত্মীয় শেখ মনি। তাঁর মন্ত্রীত্ব উজ্জ্বল করা গাজী গোলাম মোস্তফা। জলপাই রঙের কাপড় পরা রক্ষীবাহিনীর ভয়ে সদা সন্ত্রস্থ বিরোধী দল। রাস্তার পাশে না খেতে পেয়ে মরে পড়ে থাকা মানুষের স্তুপ। বাকশাল গঠনের মত ভয়ঙ্কর একটা সিদ্ধান্তের জন্য সময়টা মনে হয় কোন ক্রমেই উপযুক্ত ছিল না।

বাকশাল ঘোষনার বিপক্ষে তাঁর প্রতিবাদ ব্যক্ত করতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ তাঁর একান্ত সচিব আবু সাইদ চৌধুরীকে সামনে রেখে লাল টেলিফোনে বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন, "আমরা বক্তৃতায় সব সময় বলেছি একটি সুখী সমৃদ্ধিশালী দেশের কথা, যার ভিত্তি হবে গণতন্ত্র। যে গণতন্ত্রের গুণগান করেছি আমরা সব সময়, আজকে আপনি একটি কলমের খোঁচায় সেই গণতন্ত্রকে শেষ করে দিয়ে দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন। আপনার এই সিদ্ধান্তে আমি অত্যন্ত জোরের সাথে দ্বিমত পোষণ করছি।" আলাপের শেষ পর্যায় বঙ্গবন্ধুকে যে কথাটি তিনি বলেছিলেন, আবু সাইদ চৌধুরীর ভাষায়, সেটি ছিল প্রফেটিক। তিনি ইংরেজিতে বললেন, "বাই টেকিং দিস স্টেপ ইউ আর ক্লোজিং অল দা ডোরস টু রিমুভ ইউ পিসফুলি ফ্রম ইওর পজিজন। এই কথাটি আমি আমার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। মানুষের কিন্তু গত্যন্তর থাকবে না। ভবিষ্যতে আপনাকে কেউ ক্ষমতা থেকে সরাতে চাইলে সেই সরাবার জন্য গণতান্ত্রিক কোন পথ আপনি খোলা রাখছেন না। তখন একটাই পথ খোলা থাকবে আপনাকে সরাবার - আর সেটা হচ্ছে বন্দুক"। (তাজউদ্দিন আহমদ আলোকের অনন্তধারা - আবু সাইদ চৌধুরী। গ্রন্থনা ও সম্পাদনা-সিমিন হোসেন রিমি - পৃষ্ঠা-১৬৩) তবে সত্যিকার বাস্তব যে আরও কত নির্মম ও নৃশংস হতে পারে স্বয়ং তাজউদ্দিন আহমেদও মনে হয় সেটা অনুমান করতে পারেননি।

ইষ্ট কোষ্ট ট্রেডিং-এর আজম চৌধুরীর দেয়া চাঁদাবাজি মামলায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরেষ্ট হলে আওয়ামী ছাউনীতে থমথমে ভাব নেমে আসে। এই মামলা উদ্দেশ্য প্রণোদিত, সাজানো, এমন লেখালেখিতে আওয়ামী সমর্থিত পত্র-পত্রিকাগুলো ভরা ছিল। কেউ কেউ আবার রাজনৈতিক পার্টির এই চাঁদা আদায়ের প্রক্রিয়ার মধ্যে দোষের কিছুই দেখতে পাননি। সিডনী প্রবাসী জনৈক কলামিষ্টতো সেদিন লিখেই ফেললেন, এই অষ্ট্রেলিয়াতেও রাজনৈতিক পার্টিগুলো তাদের দলীয় খরচ চালানোর জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চাঁদা তুলে থাকে। ঘটনাটা খুবই সত্য। তবে সেই সাথে আরও বড় একটা সত্য আছে যেটা কলামিষ্ট হয়তো ভুলে গেছেন উল্লেখ করতে, সেটা হলো এই চাঁদা আদায়ের প্রক্রিয়াটা এই সমস্ত দেশে সব সময় স্ফটিকের মতোই স্বচ্ছ হতে হয়। জনগণ সব সময়ই জানে কে চাঁদা দিচ্ছে, কাকে দিচ্ছে, কত দিচ্ছে। চাঁদা গ্রহণ করাটা মোটেই দোষের নয় তবে জোর করে, চাপ দিয়ে চাঁদা আদায় করাটা মনে হয় সব সময়ই দোষের। সেটা যেমন অষ্ট্রেলিয়ার জন্য সত্য, তেমনি বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। আর শেখ হাসিনা যে সরাসরি বা তার একান্ত ব্যক্তিগত সচিবের মাধ্যমে দলের জন্য চাঁদা গ্রহণ করতেন সেটাতো তাঁর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল নিজের মুখেই স্বিকার করেছেন। প্রশ্নতো শুধু একটাই, আজম চৌধুরী কি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে, হৃষ্ট চিত্তে এই চাঁদা দিয়েছিলেন নাকি তাকে চাঁদা দিতে বাধ্য করা হয়েছিল? চাঁদা দেয়া এবং চাঁদা দিতে বাধ্য করা যে এক জিনিষ নয় এইটুকু বোঝার ক্ষমতা নিশ্চয়ই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের আছে। লেখার ছলনায় তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা যথার্থই কঠিন।

সাম্প্রতিক বন্যা, ব্যবসা-বানিজ্যের মন্দাভাব, জিনিষ পত্রের দামের উর্ধ্বগতি এসব সত্বেও তত্বাবধায়ক সরকারের বর্তমান কর্ম প্রক্রিয়ায় মনে হয় সাধারণ জনগণের এখনও সমর্থন রয়েছে। বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় দৈনিকের জনমততো মনে হয় তেমনি ইঙ্গিত বহন করে। প্রশ্ন করা হয়েছিল, টি-আই-বি মনে করে বর্তমানে দেশে দূর্নীতির বিরুদ্ধে যে

অভিযান চলছে তাতে দূর্নীতি সূচকে দ্রুত উন্নতি ঘটবে। ৭১.৬ শতাংশ ভোটার টি-আই-বির এই বক্তব্যের সাথে একাত্ব ঘোষনা করেছিল। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে আশাব্যাঞ্জক।

শেখ সেলিম, আব্দুল জলিল, মহিউদ্দিন খান আলমগীর সহ অন্যান্য আওয়ামীলীগ নেতৃত্বের পর শেখ হাসিনাকে যেদিন চাঁদাবাজি মামলায় বন্দী করা হয়, আমার এক আওয়ামী বন্ধু সেদিন এক ঘরোয়া আলোচনায় অত্যন্ত জোরের সাথেই দাবী করেছিলেন, এ সমস্তই বিরাট পরিকল্পনার এক অংশ, সাজানো। গ্যাটকো মামলায় প্রাক্তণ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও তাঁর ছোট ছেলে কোকো এরেষ্ট হওয়ার পর আমার সেই একই বন্ধুকে সেদিনই প্রশ্ন করেছিলাম, আচ্ছা এই যে খালেদা জিয়া, কোকো, তারেক জিয়া, ফালু, বাবর এদেরকে এরেষ্ট করা হয়েছে, আপনার কি মনে হয় এদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে সত্য? অত্যন্ত দৃঢ়তা এবং নিশ্চয়তার সাথে তিনি এর সত্যতার পক্ষে তার রায় দিয়েছিলেন। বললেন, কে না জানে গত পাঁচটা বছর ধরে এরা কি না করেছে? আমি বললাম, মজার ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই। আওয়ামী ছত্রছায়ার বাইরে যারা তাদের কাছেও কিন্তু শেখ হাসিনাসহ অন্যান্য আওয়ামী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ব্যাপারে এতটুকুও সন্দেহ নেই। আর তত্বাবধায়ক সরকার সহ দুদকের মূল শক্তি মনে হয় এখানেই।

রাজনৈতিক দলের একনিষ্ট সমর্থক ছাড়া সাধারণ জনগণের সকলেই চায়, অপরাধীর বিচার হোক। বিচার হোক একই মানদন্ডে, একই দাঁড়ি-পাল্লায়। একই অপরাধের শাস্তিতে আকবরে-বাবরে, কালুতে-ফালুতে, হালিমে-সেলিমে যেন ভেদাভেদ না থাকে। একই দেশে প্রধানমন্ত্রী আর সাধারণ জনগণের বিচারে যেন একই দাঁড়ি-পাল্লা ব্যবহাহৃত হয়। জনগণ চায় একটা দৃষ্টান্ত। এমন একটা দৃষ্টান্ত, যা দেখে দূর্নীতির চিন্তাও যেন দুঃস্বপ্নের জন্ম দেয়। অন্ততঃ আগামী ৫-৭টা বছর এমন একটা অবস্থানের বড়ই প্রয়োজন আজ। তবে এই বিচার যেন কোন ক্রমেই প্রহসন না হয়, সেটা মনে হয় সবারই কাম্য। মাত্র কয়েকদিন আগে অষ্ট্রেলিয়ান রিপোর্টার জর্জ নেগাস বাংলাদেশের নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ইউনুসের কাছে বাংলাদেশে দূর্নীতির পিছনে কারণের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, দেশের মাথার উপর যারা বসে আছেন তারাই যদি দূর্নীতি করেন, তবে দূর্নীতিটা দমন করবে কে? দেশের সাধারণ জনগণ আজ একজন দূর্নীতিমুক্ত নেতার প্রতিক্ষায় প্রহর গুনছে।

শেখ হাসিনা যেদিন এরেষ্ট হন সেদিন এক ঘরোয়া আলোচনায় জনৈক বন্ধু বেশ মার্জিত এবং সেই সাথে অনেকটা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতেই বলেছিলেন, "বাংলাদেশে এসব কি শুরু হলো বলেন তো। শেষ পর্যন্ত সরকার সামাল দিতে পারবে তো?" সেদিন মনে সন্দেহ ছিল। মনে হয়েছিল, বেশী হয়ে গেল নাতো? এখন মন আগের চেয়ে মনে হয় অনেক বেশী আশাবাদী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেই মুহূর্তেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে তাৎক্ষণিক ভাবে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প অপসারণ এবং পরবর্তীতে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সরকারের সদিচ্ছা এবং প্রশাসনিক দক্ষতারই পরিচয় বহন করে। তার ও উপর দেশের বৃহৎ দুই রাজনৈত্রিক নেতৃত্ব ও প্রাক্তণ প্রধানমন্ত্রীকে দূর্নীতির দায়ে এতদিন ধরে কারারুদ্ধ করে রাখার ক্ষমতা এবং সেই সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখার দক্ষতা আস্থা অর্জনে সহায়তা করে। তবে সব ভাল, যার শেষ ভাল। সেই শেষ ভালটা যে কি সেটা দেখার জন্য পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রায় প্রতিটি বাংলাদেশী আজ অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছে।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ ও দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষনা করে দূর্নীতির বিরুদ্ধে জ্বেহাদ ঘোষনা করেছিলেন। বাংলাদেশের তত্বাবধায়ক সরকারের বর্তমান প্রক্রিয়া যেন পাকিস্তানের মতো একটা প্রহসনের রাজনীতিতে রুপান্তরিত না হয়, সাধারণ জনগণের সেইটা ঐকান্তিক প্রত্যাশা।

জয়নাল আবেদীন, সিডনী, ১১ অক্টোবর, ২০০৭
jabedin@aapt.net.au